দারিদ্র দূরীকরণ ও নারী উন্নয়নে রেশম শিল্পের অবদান

রাজীব আল মামুন

একটি রাষ্ট্রের আর্থসামাজিক উন্নয়নের পরিমাপক হিসেবে দারিদ্র্যমোচন অন্যতম। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন বিশ্ববাসীর সামনে উন্নয়নের রোল মডেল। বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসনে সরকারি- বেসরকারি এবং বহুবিধ সামাজিক উদ্যোগের সমন্বিত প্রয়াসে গত এক দশকে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণে লাগসই কৌশলসমূহ যেমন- দারিদ্র্য ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ,আর্থিক প্রণোদনা,ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে উৎসাহ প্রদান,কার্যকর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি, বেকার জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে কাজের সুযোগ করে দেওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতা বিনির্মাণ ইত্যাদি প্রয়োগে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যমোচনে বিশেষজ্ঞদের নজর কেড়েছে।

দেশের দারিদ্রের হার বেশি রংপুর বিভাগে। এ বিভাগের দারিদ্র্যের হার ৪৭.২৩ শতাংশ, এরপর আছে ময়মনসিংহ ৩২.৭৭ শতাংশ এবং রাজশাহী ২৮.৯৩ শতাংশ। দেশের সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষের বসবাস ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানে ০.৪ শতাংশ। আর সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বসবাস কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিব পুর উপজেলায় ৭৯.৮ শতাংশ। সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বদ্ধপরিকর। এসডিজির অভীষ্ট ও লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে যে সব বিষয়ের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে তা হলো আন্তর্জাতিকতা,সমন্বিত গতিপ্রকৃতি ও টেকসই উন্নয়নের সকল প্রকার মাত্রা অনুসরণ, বাস্তব ও জ্ঞানভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সবচেয়ে দরিদ্র, সবচেয়ে ভঙ্গুর ও সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি গুরুত্ব প্রদান। সরকার এসডিজি বাস্তবায়নে ' সমগ্র সমাজ ' পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে। উত্তর জনপদের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকার ইতিমধ্যে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এগুলোর একটি হলো রেশম চাষ এবং এ শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ। রেশম চাষের একটি সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হলো রেশম চাষ ধনী থেকে দরিদ্রদের কাছে সম্পদ হস্তান্তর করতে পারে। রেশম চাষের সাথে জড়িত প্রায় সকলেই গরিব আর রেশম দ্বারা তৈরি পোশাক ব্যবহার করে ধনীরা। ফলে ধনীদের টাকা গরিবদের কাছে স্থানান্তরিত হয়। রেশম চাষ খুব সহজেই বাড়িতে করা যায়, এটি প্রকৃতিগতভাবে একটি গৃহপালিত উৎপাদন প্রক্রিয়া। এ কাজটি বাড়ির মহিলারা অন্যান্য কাজের পাশাপাশি করে থাকে ফলে অতিরিক্ত কোনো জনবলের প্রয়োজন হয় না। পরিবারের সদস্যরা তাদের অব্যবহৃত শ্রমকে কাজে লাগিয়ে এবং স্বাভাবিক দৈনন্দিন কাজকর্মে কোনো বিঘ্ন না ঘটিয়ে রেশম উৎপাদন করতে পারেন। পরিবারের মহিলারা রেশম উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সরাসরি যুক্ত থাকায় পরিবারের কাছে মহিলারা অর্থ উপার্জনকারী হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণও সহজ হয় ।অর্থাৎ রেশম চাষের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নও বাস্তবায়ন হয়ে থাকে।কারণ বাংলাদেশের কম বেশি ৮৫ শতাংশ রেশম চাষি নারী। ছোটো পরিসরে রেশম চাষের জন্য অতিরিক্ত জমি, সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয় না। রেশম চাষ পরিবেশ ও শ্রমবান্ধব।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণণা ২০২২ অনুযায়ী রাজশাহী বিভাগের মোট জনসংখ্যা ২ কোটি ৩ লাখ ৫৩ হাজার ১১৯ জন। এর মধ্যে গ্রামে বসবাস করে ১ কোটি ৫৫ লাখেরও বেশি মানুষ। এ বিভাগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে ২ লাখ ৪৪ হাজারেরও বেশি। এদের অধিকাংশই দরিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে একটা বড়ো অংশই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করে। রংপুর বিভাগের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৭৬ লাখের ও বেশি। এর মধ্যে গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে ১ কোটি ৩৭ লাখেরও বেশি মানুষ। এ বিভাগে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী আছে ৯১ হাজারেরও বেশি। এদের অধিকাংশই চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছে। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এসব দরিদ্র মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে আনা হয়েছে। এসব এলাকায় সরকার বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেস্ট রিলিফ, ফেয়ার প্রাইস কার্ড, আশ্রয়ণ,গৃহায়ণ, ঘরে ফেরা,বয়স্ক ভাতা,এতিম, প্রতিবন্ধী ভাতা,দুঃস্থ মহিলা ভাতা,বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তদের ভাতা প্রদানসহ আরও নানারকম কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি কর্মক্ষম মানুষকে বিভিন্ন রকম প্রশিক্ষণ দেওয়াসহ তাদের বিনা জামানতে প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি রেশম চাষ হয়।তবে বিগত বছরগুলোতে রংপুর অঞ্চলে রেশম চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম নীলফামারী ও রংপুর জেলার প্রত্যান্ত অঞ্চলে রেশম চাষের বিস্তার ঘটেছে। এ অঞ্চলের মহিলারা নামমাত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে আবার অনেকেই পাশের বাড়ি মহিলার দেখাদেখি তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে নিজের বসত বাড়িতেই রেশম চাষ শুরু করেছে। এর ফলে রংপুর অঞ্চলের নতুন নতুন এলাকা রেশম চাষের আওতায় আসছে। বাংলাদেশে বছরে রেশম সুতার চাহিদা কম বেশি ৪ শত মেট্রিক টন,আর আমাদের দেশে উৎপাদন হয় মাত্র ৩৫-৪০ মেট্রিক টন। ঘাটতি সুতার চাহিদা আমদানির মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

বর্তমান বিশ্বে কম বেশি ৪৫ টি দেশে রেশম চাষ হয়ে থাকে। এর মধ্যে চীন, ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রধান রেশম উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশও ধীরে ধীরে রেশমের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশ রেশম উৎপাদনে বিশ্বে দশম।বিশ্বে চার ধরনের রেশম চাষ হয়ে থাকে। এগুলো হলো ইরি,তুঁত, মুগা ও তসর।তবে বাংলাদেশে শুধু তুঁতপাতা নির্ভর রেশম উৎপাদন হয়ে থাকে। রেশম চাষের দুটি প্রধান ধাপ রয়েছে। এগুলো হলো তুঁত গাছের চাষ এবং রেশম কীট পালন। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ রেশম কীটকে পলু নামে ডাকে। রেশম কীটের একমাত্র খাদ্য হলো তুঁত গাছের পাতা। তুঁত গাছ একবার রোপণ করলে ২০-২৫ বছর পর্যন্ত পাতার ফলন দেয়। বেশি চাষেরও দরকার হয় না। বছরে ৩-৪ বার খোঁড়,নিড়ানি ছাঁটাই এবং প্রয়োজনে পানি সেচ

দেওয়া লাগে। এতে অন্য ফসলের তুলনায় চাষাবাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম। ছায়াযুক্ত স্থান বাদে বাড়ির আঙিনায়, আনাচে কানাচে, রাস্তার পাশে চাষযোগ্য পানি জমে না এমন জমিতে চাষ করা যায়। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড বিএসআরটিআই - এর সহায়তায় রেশম চাষিদের প্রয়োজন অনুযায়ী তুঁত গাছের চারা এবং রোগমুক্ত রেশম ডিম বিনামূল্যে সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়াও সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় রেশম চাষিদের সব ধরনের ভৌত ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিয়ে আসছে। এ সব সহায়তার মধ্যে রয়েছে তুঁত চারা সরবরাহ, তুঁত চারা রোপণ এবং যতক্ষণ না চারাগুলো উৎপাদনশীল হয় ততক্ষণ তুঁত গাছের রক্ষণাবেক্ষণের সহায়তা, রেশম কীট পালন ও রিলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে রোগমুক্ত রেশম ডিম সরবরাহ, রেশম পোকা পালনের জন্য পলুঘর (বিয়ারিং হাউজ) নির্মাণের জন্য অর্থ সহায়তা, রেশম কীট বা পলু পালনের উপকরণ যেমন ডালা, চন্দ্রকি, ঘরা ইত্যাদি এবং সবশেষে উৎপাদিত কোকুনগুলোর জন্য বিপনণ সহায়তা। রেশম চাষ থেকে গরিব পরিবারগুলো গড়ে বছরে ১৬ হাজার টাকার মতো আয় করে থাকে। তবে কোনো কোনো পরিবার বছরে কম বেশি অর্ধ লক্ষ টাকা আয় করে। তবে শুধু রেশম চাষই দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে না। তবে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষরা অন্যান্য পেশার সাথে রেশম চাষের মাধ্যমে তাদের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে পারে।

রেশম চাষ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে পুনর্বাসনসহ আর্থিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে আসতে সহায়তা করছে। দরিদ্র মানুষ যখন তাদের নিজস্ব কোনো উদ্যোগে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়, তখন তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষমতা অর্জন করে। রেশম চাষির নিকট সমাজের ধনীদের অর্থ স্থানান্তর হয়ে আসে ফলে রেশম চাষ অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখে।সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় গ্রামের দরিদ্র মহিলারা। রেশম চাষের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার নারীর অংশ গ্রহণ এবং নারী নির্যাতন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।প্রত্যান্ত অঞ্চলের নারীরা সচেতন হচ্ছে, তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটছে যা নারী উন্নয়নেরই শুভ লক্ষণ।

#

লেখক: টেক্সটাইল ইঞ্জিয়ার ও গবেষক

পিআইডি ফিচার